লোকসংস্কৃতিতে শেরে বাংলা গোল্ডেন পদক পেলেন ধীরু বাউল

গ্রামবাংলার প্রায় হারিয়ে যাওয়া লোকসংস্কৃতি ও লোকঐতিহ্য দেশ বিদেশে তুলে ধরা- শুদ্ধ ধারার সংস্কৃতির প্রচার প্রসার ও সংগীতের আলো ছড়ানোর অবদান হিসেবে এবার চুয়াডাঙ্গা জেলার কৃতি সন্তান মনিরুজ্জামান ধীরু বাউল শেরে বাংলা গোল্ডেন (অ্যাওয়ার্ড) পদক পেয়ে সংগীত যোদ্ধাদের মুখ উজ্জল করলেন।

গতকাল শুক্রবার বিকাল ৫ টায় ঢাকা সেগুন বাগিচা কচিকাঁচার মেলা মিলনায়তনে অবিভক্ত বাংলার জাতীয় নেতা শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এর ১৫২ তম জন্মবার্ষিকীতে আলোচনা সভা ও গুনিজন সংবর্ধনা অনুস্ঠান সম্পন্ন হয়। পরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্ব স্ব কাজে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখায় তাদেরকে শেরে বাংলা গোল্ডেন অ্যাওয়ার্ড পদক, সম্মান স্মারক, সার্টিফিকেট তুলে দেয়া হয়।

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক স্মৃতি পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা এবং তার দৌহিত্র সাবেক তথ্য সচিব, বিটিআরসির চেয়ারম্যান সৈয়দ মার্গুব মুর্শেদ এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা বিচারপতি মীর হাসমত আলী, প্রধান আলোচক অধ্যাপক মোহাম্মদ আহসান উল্লাহ ।

সংগঠনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও মহাসচিব দেশের গুনিজনদের ধন্যবাদ, অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। পরে প্রধান ও বিশেষ অতিথি সারা দেশের ৬৪ জেলার ৬৭ জনকে শেরে বাংলা গোল্ডেন অ্যাওয়ার্ড পদক হাতে তুলে দেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন, এ টি এন বাংলার উপস্হাপিকা তানিয়া আফ্রিন।

আলমডাঙ্গা বেলগাছি ইউনিয়ন

পরিষদে জাতীয় পতাকার অবমাননা

আলমডাঙ্গার বেলগাছী ইউনিয়ন পরিষদে জাতীয় পতাকার অবমাননা, বৃষ্টিতে ভিজলো পতাকা। দায়িত্বে যারা ছিল তারা নীরব।

আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছী ইউনিয়ন পরিষদে ঘটেছে জাতীয় পতাকার অবমাননার এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটের দিকে স্থানীয় যুবক আব্দুর রকিব জীবন দেখেন , জাতীয় পতাকা বৃষ্টির পানিতে ভিজছে। তিনি তা ফেসবুকে সরাসরি লাইভ করেন, যা মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায় এবং এলাকায় ব্যাপক ক্ষোভ ও সমালোচনা সৃষ্টি করে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, সকাল ১০টায় ইউনিয়ন পরিষদে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। বিকেল চারটায় অফিস বন্ধ হয়ে গেলে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী পতাকা নামানো হয়নি। এতে পতাকা চরম অবহেলা ও দায়িত্বহীনতার শিকার হয়।

সাধারণ মানুষ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, জাতীয় পতাকা কোনো সাধারণ কাপড় নয়, এটি লাখো শহীদদের রক্তে রঞ্জিত স্বাধীনতার প্রতীক। এর প্রতি অবহেলা পুরো জাতির প্রতি অসম্মান।

এ ঘটনায় অভিযোগ উঠেছে ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান মো. মেহেরাজ আলী এবং গ্রাম পুলিশের অবহেলার বিরুদ্ধে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তি বলেন, প্যানেল চেয়ারম্যান নিয়মিত সময়মতো অফিসে আসেন না এবং সরকারি বিধি-বিধান উপেক্ষা করেন। গ্রাম পুলিশরাও পতাকা নামানোর দায়িত্বে অবহেলা করেছেন। আইনের দিক থেকে বিষয়টি গুরুতর। বাংলাদেশ পতাকা বিধিমালা , ১৯৭২-এর ধারা ৭(৩) অনুযায়ী বৃষ্টি, ঝড় বা প্রতিকূল আবহাওয়ায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা যাবে না। এছাড়া বাংলাদেশ দণ্ডবিধি, ১৮৬০-এর ১২৩(ক) ধারা রাষ্ট্রীয় প্রতীক বা জাতীয় পতাকার প্রতি অবমাননাকর আচরণকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করে।

এ বিষয়ে প্যানেল চেয়ারম্যান মেহেরাজ আলীর সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, আমি ট্রেইনিং করতে গিয়েছিলাম, আমি কিছু জানি না। তাঁকে আরও প্রশ্ন করা হয়, এখনও পতাকা ইউনিয়ন পরিষদ থেকে নামানো হয়েছে কি? উত্তরে তিনি বলেন, এসব কিছুই আমি জানি না।

স্থানীয় নাগরিক সমাজ প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছে, যাদের অবহেলায় জাতীয় পতাকা বৃষ্টিতে ভিজেছে, তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে। জাতীয় পতাকা শুধু প্রতীক নয় , এটি আমাদের অস্তিত্ব ও স্বাধীনতার প্রতিচ্ছবি। এর প্রতি অবহেলা মানে বাংলাদেশের প্রতি অবমাননা।

আলমডাঙ্গায় ট্রেনের ছাদে ঝুলন্ত তারে পথশিশুর মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় খুলনাগামী ট্রেনের ছাদে উঠে এক পথশিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৯টার দিকে আলমডাঙ্গা লালব্রিজের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রায় ১০-১১ বছর বয়সী শিশুটি ট্রেনের ছাদে বসা অবস্থায় উপরে ঝুলে থাকা রেলের টেলিফোন তারে গলা পেঁচিয়ে গুরুতর আহত হয়। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

পুলিশ জানায়, নিহত শিশুটির নাম শাওন (প্রায় ১১), সে ঢাকার কমলাপুর রেলস্টেশনের আশপাশে বসবাস করত। জীবিকার সন্ধানে কয়েকজন পথশিশু একসাথে খুলনা যাচ্ছিল। পথে আলমডাঙ্গায় ঘটে যায় দুর্ঘটনা।

ওসমানপুর পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ আলমগীর হোসেন বলেন, আমরা শিশুটির সম্পূর্ণ পরিচয় নিশ্চিতের চেষ্টা করছি। ধারণা করা হচ্ছে, সে কমলাপুর এলাকার পথশিশুদের একজন।

প্রাণঘাতী বজ্রপাত: সচেতনতা ও আগাম সতর্কতা

যেসব ঘটনা মানুষের স্বাভাবিক জীবন ধারাকে ব্যাহত করে মানুষের সম্পদ ও পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে এবং যার জন্য আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে ব্যতিক্রমধর্মী প্রচেষ্টার মাধ্যমে মোকাবিলা করতে হয়, তাদের দুর্যোগ বলে। আর প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্ট দুর্যোগকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলা হয়। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলো – অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, খরা, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, নদী ভাঙন, ভূমিকম্প, বজ্রপাত, ইত্যাদি। বজ্রপাত হলো মেঘের মধ্যে বা মেঘ থেকে ভূমি পর্যন্ত সৃষ্ট বৈদ্যুতিক চার্জের এক ধরনের নির্গমন। যখন মেঘে থাকা ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চার্জের পরিমাণ বেশি হয়ে যায়, তখন তাদের মধ্যে বা মেঘের নিচের ভূমির সাথে চার্জের সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষের ফলে আলোকরশ্মি ও শব্দের সৃষ্টি হয়, যা আমরা আলো ঝলকানি ও বিকট শব্দ হিসেবে শুনতে পাই।

বাংলাদেশে বজ্রপাতের মূল কারণ দেশটির ভৌগোলিক অবস্থান। কারণ, বাংলাদেশের একদিকে বঙ্গোপসাগর, এরপরই ভারত মহাসাগর। সেখান থেকে গরম আর আর্দ্র বাতাস আসছে। আবার উত্তরে রয়েছে পাহাড়ি এলাকা, কিছু দূরেই হিমালয় রয়েছে, যেখান থেকে ঠান্ডা বাতাস ঢুকছে। এই দুই বাতাসের সংমিশ্রণে বজ্র মেঘ তৈরি হয় এবং এসব মেঘের সাথে মেঘের ঘর্ষণে বজ্রপাত হয়। বাংলাদেশে উত্তরাঞ্চল এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চল বজ্রপাতপ্রবণ এলাকাগুলোর অন্যতম। গ্রীষ্মকালে এ অঞ্চলে তাপমাত্রা বেশি থাকায় এ পরিস্থিতির তৈরি হয়। আবহাওয়াবিদদের মতে, যেসব এলাকায় গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকে সেসব এলাকায় যে মেঘের সৃষ্টি হয়, সেখান থেকেই বজ্রপাতের সম্ভাবনা থাকে। তাপমাত্রা এক ডিগ্রি বাড়লে বজ্রপাতের সম্ভাবনা ১০ শতাংশ বেড়ে যায়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ ঘন ঘন বজ্রপাতজনিত দুর্যোগের ঝুঁকিতে রয়েছে। লম্বা গাছ কেটে ফেলায় গ্রামীণ এলাকায় বজ্রপাতের ঝুঁকি আরও বেড়েছে। গাছ কেটে ফেলার ফলে প্রাকৃতিকভাবে বজ্রপাত থেকে সুরক্ষা হ্রাস পেয়েছে ও মানুষের জন্য ঝুঁকি বেড়েছে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে, প্রাক-বর্ষাকাল অর্থাৎ, মার্চ থেকে মে মাসে দেশে ৩৮ শতাংশ বজ্রঝড় হয়। বর্ষা অর্থাৎ, জুন থেকে সেপ্টেম্বর এই চার মাসে ৫১ শতাংশ বজ্রঝড় হয়। বাংলাদেশে প্রতিবছর

গড়ে ৮৪ লাখ বজ্রপাত হয়, যার ৭০ শতাংশই হয় এপ্রিল থেকে জুন মাসে। আবহাওয়াবিদদের পর্যবেক্ষণে বাংলাদেশে উত্তর, উত্তর পূর্ব এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চল সবচেয়ে বেশি বজ্রপাতপ্রবণ। বজ্রপাতে হতাহতের ঘটনা বেশি ঘটে হাওর অঞ্চলে। কেননা এসব অঞ্চলে জলীয় বাষ্প বেশি থাকে। সে হিসেবে নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সিলেট এবং সেইসাথে টাঙ্গাইল, জামালপুর, ময়মনসিংহ বজ্রপাতের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। এছাড়া, রংপুর, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়ও বজ্রঝড় বেশি হয়। বজ্রপাতে বেশি মৃত্যু হয় কৃষকদের। কারণ, তাঁরা খোলা মাঠে কাজ করেন এবং খালি পায়ে কাজ করেন। আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রতিবছর বজ্রপাতে ১৫০ থেকে ২০০ মানুষ মারা যায় যাদের বেশিরভাগই কৃষক। সেইসঙ্গে অনেক গবাদি পশুও মারা যায়। বার্ষিক প্রাণহানির এই সংখ্যার বিচারে সারা বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান পঞ্চম। মৃত্যুর সংখ্যা বিচার করে সরকার ২০১৬ সালে বজ্রপাতকে জাতীয় দুর্যোগ হিসেবে ঘোষণা করে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বনাঞ্চল বৃদ্ধিসহ সরকার বিভিন্ন কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার বজ্রপাতে মৃত্যু কমাতে আগাম সতর্কতা বা পূর্বাভাস দেওয়া এবং সচেতনতা বাড়াতে নিরলসভাবে কাজ করছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক ই আজম কালের কণ্ঠকে বলেন, “আমরা এখন গুরুত্ব দিচ্ছি আর্লি ওয়ার্নিংয়ে (আগাম সতর্কতায়)। এখন ১০ থেকে ১৫ মিনিট আগে বজ্রপাতের পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব। আর্লি ওয়ার্নিং যদি আমরা যথাযথ সময়ে দিতে পারি এবং এসএমএস বা ফোন কলের মাধ্যমে মানুষকে সতর্ক করে দিতে পারি, তাহলে তা কাজে দেবে বলে মনে করি। সেই নিরিখেই কাজ হচ্ছে এখন। আধঘণ্টা আগেও বজ্রপাতের পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব। আধঘণ্টা মানে অনেক সময়। আধঘণ্টা আগে যদি আমরা পূর্বাভাস দিয়ে সতর্ক করতে পারি, তাহলে অনেক জীবন বাঁচানো সম্ভব। এদিকে আবহাওয়া অধিদপ্তর প্রথমবারের মতো বজ্রপাতের সতর্কবার্তা জারি করেছে চলতি বছরের ১৭ এপ্রিল। সেদিন প্রথম সতর্কবার্তায় দেশের ২৭ জেলার জন্য বজ্রপাত ও বজ্রবৃষ্টির সতর্কতা জারি করে অধিদপ্তর। এর পর থেকে নিয়মিত বজ্রপাতের আগাম সতর্কতা ও পূর্বাভাস দিয়ে আসছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। কিন্তু, বজ্রপাতের তথ্য বা সতর্কতা প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছানোই সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ। তাই, যেসব অঞ্চলে একটি নির্দিষ্ট সময়ে বজ্রপাতের আশঙ্কা রয়েছে, সেসব এলাকার মোবাইল টাওয়ার ব্যবহার করে মেসেজ বা ফোনকলের মাধ্যমে এলাকাবাসীকে সতর্ক করা যেতে পারে। বজ্রপাতে মৃত্যু ও ক্ষয়ক্ষতি

রোধে আগাম সতর্কতা ও সচেতনতার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে আগাম সতর্কতা প্রদান সম্পর্কে সচেতনতা তৈরিতে গার্লস গাইড, বয়জ স্কাউট, রেড ক্রস, ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কমিটির স্বেচ্ছাসেবীসহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে কাজে লাগানো যায়। তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে বজ্রপাতসহ বিভিন্ন দুর্যোগ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার কাজে সম্পৃক্ত করা গেলে সাধারণ মানুষের কাছে দ্রুত বজ্রপাতের তথ্য পৌঁছানো সম্ভব হবে। বজ্রপাত থেকে নিরাপদ থাকতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বজ্রপাতের সময় করণীয় সম্পর্কে সুপারিশমালা তৈরি করেছে। বজ্রপাতের সময় তা অনুসরণ করলে অনেক বিপদ থেকে নিরাপদ থাকা যাবে। তাই, বজ্রপাত থেকে নিরাপদ থাকতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সুপারিশমালা মানা খুব জরুরি।

এপ্রিল-জুন মাসে বজ্রবৃষ্টি বেশি হয়; বজ্রপাতের সময়সীমা সাধারণত ৩০-৪৫ মিনিট স্থায়ী হয়। এ সময়টুকু ঘরে অবস্থান করতে হবে। ঘন কালো মেঘ দেখা দিলে ঘরের বাহিরে না যাওয়া; অতি জরুরি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে রবারের জুতা পড়ে বাইরে বের হওয়া। বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গা, খোলা মাঠ অথবা উঁচু স্থানে না থাকা। বজ্রপাতের সময় ধানক্ষেত বা খোলা মাঠে থাকলে তাড়াতাড়ি পায়ের আঙ্গুলের ওপর ভর দিয়ে এবং কানে আঙ্গুল দিয়ে মাথা নিচু করে বসে থাকতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব দালান বা কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিতে হবে। টিনের চালা যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে। উঁচু গাছপালা ও বৈদ্যুতিক খুঁটি ও তার বা ধাতব খুঁটি, মোবাইল টাওয়ার ইত্যাদি থেকে দূরে থাকতে হবে। কালো মেঘ দেখা দিলে নদী, পুকুর, ডোবা বা জলাশয় থেকে দূরে থাকতে হবে। বজ্রপাতের সময় গাড়ির ভেতর অবস্থান করলে, গাড়ির ধাতব অংশের সাথে শরীরের সংযোগ ঘটানো যাবে না; সম্ভব হলে গাড়িটি নিয়ে কোনো কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নিতে হবে। বজ্রপাতের সময় বাড়িতে থাকলে জানালার কাছাকাছি ও বারান্দায় থাকা যাবে না। জানালা বন্ধ রাখুন এবং ঘরের ভিতরে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম থেকে দূরে থাকতে হবে। বজ্রপাতের সময় মোবাইল, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, ল্যান্ডফোন, টিভি, ফ্রিজসহ সকল বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে এবং এগুলো বন্ধ রাখতে হবে। বজ্রপাতের সময় ধাতব হাতলযুক্ত ছাতা ব্যবহার করা যাবে না। জরুরি প্রয়োজনে প্লাস্টিক বা কাঠের হাতলযুক্ত ছাতা ব্যবহার করতে হবে। বজ্রপাতের সময় শিশুদের খোলা মাঠে খেলাধুলা থেকে বিরত রাখতে হবে এবং নিজেদেরও বিরত রাখতে হবে। বজ্রপাতের সময় ছাউনি বিহীন নৌকায় মাছ ধরতে যাওয়া যাবে না, তবে এ সময় সমুদ্র বা নদীতে থাকলে মাছ ধরা বন্ধ

রেখে নৌকার ছাউনির নিচে অবস্থান করতে হবে। প্রতিটি বিল্ডিং-এ বজ্র নিরোধক দন্ড স্থাপন নিশ্চিত করতে হবে। খোলাস্থানে অনেকে একত্রে থাকাকালীন বজ্রপাত শুরু হলে প্রত্যেকে ৫০ থেকে ১০০ ফুট দূরে সরে যেতে হবে। কোনো বাড়িতে যদি পর্যাপ্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা না থাকে তাহলে সবাই এক কক্ষে না থেকে আলাদা আলাদা কক্ষে যেতে হবে। বজ্রপাতে কেউ আহত হলে বৈদ্যুতিক শকে আহতদের মতো করেই চিকিৎসা করতে হবে। প্রয়োজনে দ্রুত চিকিৎসককে ডাকতে হবে বা হাসপাতালে নিতে হবে। বজ্র আহত ব্যক্তির শাস-প্রশ্বাস ও হ্রদ স্পন্দন ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড়ের মতো দুর্যোগের ক্ষেত্রে কিছু প্রস্তুতি নেবার সুযোগ থাকলেও বজ্রপাতের বিষয়টি অনেকটা ভূমিকম্পের মতোই আকস্মিক। কিন্তু আবহাওয়াবিদরা, রেডার ইমেজে মেঘের অবস্থান অনেক ওপরের দিকে দেখলে সেইসাথে বায়ুমণ্ডলে অস্থিতিশীল অবস্থা থাকলে দুই নম্বর সতর্ক সংকেত দিয়ে থাকেন। এমন অবস্থায় আকাশে কালো মেঘ ও বিদ্যুৎ চমকাতে দেখলেই সবাইকে সাথে সাথে খোলা জায়গা ছেড়ে দ্রুত নিরাপদে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা। এসব পরামর্শ মেনে চললে অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদ থেকে নিরাপদে থাকা যাবে। বাড়ি-ঘর তৈরির সময় অবশ্যই আর্থিনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। কোনো বাড়ি-ঘর বিদ্যুতায়িত হলে যাতে তা প্রাকৃতিকভাবেই নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। মৃত্যঝুঁকি কমিয়ে আনতে বজ্রপাত শেল্টারের পাশাপাশি বাড়াতে হবে লাইটনিং প্রটেস্ট সিস্টেম (এলপিএস) । বিভিন্ন স্থাপনাতে যদি এলপিএস লাগানো যায় এবং যদি এলাকাভিত্তিক সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন করা যায়, তাহলে বজ্রপাতের ঝুঁকি অনেক কমে যাবে। এছাড়া, সচেতনতা বৃদ্ধি, উন্নত পূর্বাভাস ব্যবস্থা এবং নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণও অত্যন্ত জরুরি। গাছ তার জীবন দিয়ে বজ্রপাত থেকে মানুষ ও অন্য প্রাণীর জীবন রক্ষা করে। ফলে এই মুহূর্তে আমাদের করণীয়, দ্রুত বর্ধনশীল গাছের চারা রোপণ করা। তাছাড়া, বজ্রপাত যেহেতু জলবায়ুসংক্রান্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলবায়ু দূষণ প্রতিরোধ ও বৈশ্বিক তাপমাত্রা কমানোর ক্ষেত্রেও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ, বিশ্বের সকল বিজ্ঞানীই একমত যে, জলবায়ু দূষণের ফলে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেড়ে গেছে। জলবায়ু দূষণের ক্ষেত্রে পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশগুলোই বেশি দায়ী। বাংলাদেশসহ দরিদ্র দেশগুলোর দায় অনেক কম, কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয় বেশি। কাজেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পেতে হলে বা একে মোকাবিলা করতে হলে সারাবিশ্বকেই একযোগে উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশগুলো রক্ষার জন্য

শিল্পোন্নত দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে সাহায্য দিতে হবে। ক্ষতিপূরণসহ আন্তর্জাতিক তহবিল সংগ্রহের জন্য সরকারকেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। তাছাড়া, সরকারকেও বজ্রপাতসহ সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধের জন্য জাতীয় বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করতে হবে এবং প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত এ বরাদ্দের কার্যক্রম পৌঁছে দিতে হবে। তবেই, এর সুফল সবাই পাবে।

লেখক: সহকারী তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদপ্তর

মুজিবনগর সীমান্তে ২৯ বাংলাদেশিকে বিজিবি’র কাছে হস্তান্তর

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার সীমান্ত দিয়ে কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ের পতাকা বৈঠকের পর ভারতে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী নারী, পুরুষ ও শিশুসহ ২৯ জন বাংলাদেশিকে বিজিবি’র কাছে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় তাদের হস্তান্তর করা হয়। ৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ন এবং ভারতের ১৬১ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের কোম্পানি কমান্ডারের মধ্যে সীমান্তের ১০৫ পিলারের কাছে শূন্যরেখায় আনুষ্ঠানিক পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের পর বিভিন্ন সময়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশকারী ২৯ জন বাংলাদেশি নাগরিককে বিএসএফ আনুষ্ঠানিকভাবে বিজিবি’র কাছে হস্তান্তর করে।

হস্তান্তরিতদের মধ্যে ১১ জন পুরুষ, ১৭ জন নারী ও ১ জন শিশু রয়েছেন। তারা যশোর জেলার বেনাপোলের ঢালিপাদা গ্রামে একামুল গাইন এর ছেলে মিরাজ একরামুল গাইন(১৯), যশোর নাভারণের নাভারণ গ্রামের ওসমান আলী মন্ডলের স্ত্রী আমিনা খাতুন (৩৩), যশোর নাভারণের নাভারণ গ্রামের ইউনুস মোড়লের মেয়ে নার্গিস খাতুন(৩০), যশোর শার্শা এর সেটাই গ্রামের লালন শেখের স্ত্রী রুনা খাতুন (৩০), যশোর কালিহাতীর হিদিয়া গ্রামের রহমত মোল্লার মেয়ে সালমা

খাতুন (৩৩), ঝিনাইদহ সদর উপজেলার উলাকল গ্রামের জাহারুল গাজীর মেয়ে সুপ্রিয়া খাতুন (২৮), ঝিনাইদহ মহেশপুরের গোয়াগারি গ্রামের আব্দুল বারেকের মেয়ে জমিলা খাতুন (৩৭), যশোর বাঘারপাড়ার দুরাঝাপ গ্রামের আকরাম সুখের মেয়ে জ্যোৎস্না (৩৫), নড়াই কালিয়ার জামিরডাঙ্গা গ্রামের ইসমাইল শেখের ছেলে আকরাম (২২), যশোর ঝীগরগাছা গ্রামের মশিয়ার রহমান এর ছেলে তুহিন (৩৯), যশোর কালিহাতীর হিদিয়া গ্রামের লিয়াকত খানের ছেলে সুলতান (২০), যশোর শার্শা এর অগ্রভুলাট গ্রামের শাহজাহান এর মেয়ে পায়েল (৩৩), কুমিল্লা বারুয়ার কাকের তলা গ্রামের আব্দুল শেখের ছেলে বিল্লাল হোসেন (৪৩), নড়াইল কালিয়ার বাঁধানল গ্রামের মসিব শেখের স্ত্রী রোকসানা (৪৫), যশোর শার্শা এর দাওয়াতখালি গ্রামের মুসলিম সরদারের মেয়ে মমতাজ (৪৫), যশোর শার্শা এর দাওয়াতখালি গ্রামের রফিক মন্ডলের মেয়ে রেহেনা (২৪), যশোর শার্শা এর দাওয়াতখালি গ্রামের রফিক মন্ডলের ছেলে উজ্জল (৪৫), নড়াইল সদরের তারাপুর গ্রামের সবুর মোল্লার ছেলে জসিম (৩৪), জসিমের স্ত্রী মোরশেদা খাতুন (২৩) নড়াইল সদরের তারাপুর গ্রামের আবুল মোল্লার ছেলে রানা মোল্লা (৩১), নড়াইল জেলার কালিয়ার জামিরডাঙ্গা গ্রামের আকাশ গাজীর ছেলে শেকু গাজী (৪০), নড়াইল জেলার কালিয়ার জামিরডাঙ্গা গ্রামের আব্দুল গাজীর স্ত্রী আসমা খাতুন (৫১), যশোর জেলার অভয়নগরের রানাগাতী গ্রামের ইমান আলীর ছেলে বাকি বিল্লাহ (২৪), মৌলভীবাজার সদরের দক্ষিণ সাগর গ্রামের সোনা মিয়ার সুমাইয়া খাতুন (২৫), ঢাকা কেরানীগঞ্জ কদমতলীর নুসরাত জাহান (২৫), চট্টগ্রাম আটহাজারী আব্দুল করিম সওদাগরের ছেলে নুরুল আলম (৩৬), নড়াইল জেলার কালিয়ার পেরুলী গ্রামের কাউসার শেখের মেয়ে নাজমা খাতুন (৩৬), ঢাকার মোহাম্মদপুরের সিদ্দিকুর রহমানের মেয়ে জান্নাতুল(৪১)।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, তারা বিভিন্ন সময়ে সীমান্তের বিভিন্ন স্থান দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। সব প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর তাদের মুজিবনগর থানায় সোপর্দ করা হয়।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মিজানুর রহমান জানান, ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশ সীমন্ত রক্ষী বাহিনী বিজিবি’র কাছে হস্তান্তর করা বাংলাদেশী ২৯ জনকে মুজিবনগর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। তাদের পরিচয় শনাক্ত করে তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

ইতিহাস গড়ার প্রস্তুতি যেভাবে নিতে চলেছেন মুশফিক

বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসাবে মুশফিকুর রহিম শততম টেস্ট খেলতে যাচ্ছেন আগামী মাসে। মিরপুরে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ঐতিহাসিক মাইলফলক ছোঁয়ার আগে নিজেকে ঝালিয়ে নিতে মুশফিক নামছেন ঘরোয়া লড়াইয়ে। জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) লংগার ভার্সনে সিলেট বিভাগের হয়ে খেলবেন এই অভিজ্ঞ উইকেটকিপার-ব্যাটার।

তবে মুশফিকের খেলার চেয়েও বেশি আলোচনা এনসিএলের ময়মনসিংহ বিভাগের অভিষেক হওয়া নিয়ে। আজ দেশের চারটি ভেন্যুতে শুরু হচ্ছে চারদিনের ম্যাচের এ প্রতিযোগিতা। এনসিএল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) ঘরোয়া ক্রিকেট কাঠামোর সবচেয়ে পুরোনো ও মর্যাদাপূর্ণ আসর।

সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে স্বাগতিকদের বিপক্ষে মাঠে নামবে নবাগত ময়মনসিংহ। সিলেট আউটার মাঠে রংপুরের প্রতিপক্ষ ঢাকা। খুলনায় স্বাগতিকরা বরিশালের বিপক্ষে খেলবে। এছাড়া স্বাগতিক রাজশাহী মুখোমুখি হবে চট্টগ্রামের।

ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি থেকে মুশফিক অবসর নিয়েছেন আগেই। টেস্টে এখনো দলের নির্ভরযোগ্য ব্যাটারদের একজন তিনি। শততম টেস্টকে সামনে রেখে দীর্ঘদিন পর এনসিএলের লংগার ফরম্যাটে খেলবেন, যাতে ম্যাচ ফিটনেস ও লম্বা ইনিংস খেলার ছন্দ ফিরে পান।

বিসিবির ঘোষিত সূচি অনুযায়ী এনসিএলের সব ম্যাচ হবে মিরপুর, রাজশাহী, সিলেট, বগুড়া, খুলনা, চট্টগ্রাম, বিকেএসপি ও কক্সবাজারের দুটি মাঠে। জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের পাশাপাশি তরুণ প্রতিভারাও খেলবেন। এবারই প্রথম এনসিএলের মূলপর্বে অংশ নিচ্ছে ময়মনসিংহ বিভাগ।

শুভাগত হোম চৌধুরীর নেতৃত্বে দলে রয়েছেন মোহাম্মদ নাঈম, মাহফিজুল ইসলাম, আইচ মোল্লা ও আল আমিন হোসেন। ২০০৫ সালে ইংল্যান্ড সফর দিয়ে টেস্ট ক্রিকেটে মুশফিকের পথচলা শুরু হয় মাত্র

১৮ বছর বয়সে। ২০ বছরের ক্যারিয়ারে ৯৮ টেস্ট খেলেছেন তিনি। নভেম্বরে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দুই ম্যাচের হোম সিরিজে খেলে বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসাবে শততম টেস্ট খেলার অনন্য গৌরবের অধিকারী হবেন মুশফিক।

সূত্র: যুগান্তর ।

চুয়াডাঙ্গার মুন্সিপুর সীমান্তে স্বর্ণের বারসহ চোরাকারবারি আটক

চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি অভিযান চালিয়ে মুন্সিপুর সীমান্ত থেকে প্রায় ২৭ লক্ষ টাকা মূল্যর ১ টি স্বর্ণের বারসহ এক চোরাকারবারিকে আটক করেছে।

জানা যায়, আজ শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল নাজমুল হাসানের বিশেষ গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালায় মুন্সিপুর সীমান্তের কুতুবপুর পাকা রাস্তার উপর। এসময় মুন্সিপুর ক্যাম্পের সুবেদার হাবিবুর রহমান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিজিবি’র ৯৩/৩-আর হতে আনুমানিক ১২শ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কুতুবপুর পাকা রাস্তার পার্শ্বে এ্যাম্বুশ করে।

পরে বিজিবি একটি মোটরসাইকেলযোগে ১ জন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে যেতে দেখতে পায়। এসময় তার গতিরোধ করে বিজিবি টহল দল ধাওয়া করে তাকে আটক করে। পরে বিজিবি দামুড়হুদা উপজেলার মুন্সিপুর গ্রামের জসিম উদ্দীনের ছেলে হাসেম বিশ্বাসকে (৪৮),আটক করে। পরে তার দেহ তল্লাশী করে অভিনব কায়দায় লুঙ্গির কোচের লুকায়িত অবস্থায় সাদা স্কচটেপ দ্বারা মোড়ানো ১টি প্যাকেট উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধারকৃত প্যাকেট হতে ১ টি স্বর্ণের বার জব্দ করা হয় যার ওজন ১৪০.৫৩ গ্রাম। এছাড়াও আটককৃত ব্যক্তির ব্যবহৃত ০১টি মোবাইল ফোন

ও ০১টি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়।

গতকালই তাকে দামুড়হুদা মডেল থানায় সুবেদার হাবিবুর রহমান বাদি হয়ে আসামীকে হস্তান্তর করেছে। এবং উদ্ধারকৃত স্বর্ণের বার চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারি অফিসে জমা দেওয়ার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ভালো মেয়ে; সমাজের তৈরি মুখোশ নাকি নারীর পরিচয় হারানোর গল্প?

ছোটবেলা থেকেই মেয়েদের শেখানো হয় “ওখানে যাবে না, ওটা সেইফ না”, “ওটা করবে না, সেইফ না”। “চুপ করে থাকো, তবেই সবাই তোমায় ভালো বলবে।” “বেশি কথা বলো না, বেশি হাসো না, বেশি মিশো না।” তুমি মেয়ে এখানে চলবে না, তুমি মেয়ে ওভাবে বলবেনা,মাথা নামিয়ে, চলো, নিচু স্বরে কথা বলো, তা না হলে লোকে খারাপ বলবে। প্রথমে মা, চাচী, দাদী বলে পরে পাড়া পড়শী মহিলারা।

যেন একটা শব্দহীন শিকল নারীর পায়ে বেড়ি দিয়েছে। যেন শব্দহীন লোহার বেড়ি নারীর গলাটাকে আটকে ধরেছে। ভালো মেয়ে হতে যেয়ে “না” শব্দের দৃশ্যহীন মালা গলায় পরে নিতে হয়েছে। এই “না” শব্দটার মাঝে অসহায়ত্বকে ফুটিয়ে তুলে বার বার স্মরণ করিয়ে দেয় তোমাকে ভালো মেয়ে হতে হবে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই নারীর পায়ে ভালো মেয়ের শব্দহীন শিকল বেঁধে রেখেছে। আসলে আমরা নারীরা ছোটবেলা থেকেই নিজেদের কন্ডিশন করে ফেলি, কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ, কোনটা সেইফ, বা কোনটা সেইফ না। কন্যা শিশু জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গেই এই কন্ডিশনিংটা ভূতের মতো বাবা-মা-পরিবারের সবার ঘাড়ের ওপরেই চেপে বসে।

সমাজে “ভালো মেয়ে” বলতেই আমরা এক ধরনের নির্দিষ্ট ছাঁচে গড়া নারীর চিত্র কল্পনা করি — যে ভদ্র, শান্ত, পর্দানশীল, সংসারী, বাধ্য, পুরুষের কথা নিঃশর্তে মেনে চলে। ছোটবেলা থেকেই মেয়েদের

শেখানো হয় — “এভাবে বসো না”, “জোরে কথা বলো না”, “রাতে বাইরে যেও না”, “ছেলেদের সঙ্গে বেশি মিশো না”, “ভালো মেয়ে এমন হয় না। ”ভালো মেয়ে সে–ই, যে চুপচাপ থাকে, প্রতিবাদ করে না, সবার কথা মেনে চলে, নিজের চাওয়া-পাওয়ার কথা প্রকাশ করে না। সমাজের চোখে যে মেয়ে বিনয়ী, বাধ্য, নিরব, আজ্ঞাবহ — তাকেই ভালো বলা হয়। কিন্তু এই ধারণা মেয়েদের নিজের চিন্তা, মতামত ও স্বপ্নকে চাপা দেয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো — এই “ভালো মেয়ে” ধারণা কি সত্যিই নারীর গুণ, নাকি সমাজের এক অদৃশ্য শিকল?

এই “ভালো মেয়ে” হওয়ার শিক্ষা ছোটবেলা থেকেই মেয়েদের মনে গেঁথে দেওয়া হয়। ফলে মেয়েরা বড় হয় এক ধরনের অন্তর্নিহিত ভয়, বাধ্যতা আর অপরাধবোধ নিয়ে। অর্থাৎ, সমাজ মেয়েদের ভদ্রতা শেখায়, কিন্তু আত্মবিশ্বাস শেখায় না। ফলে তারা বড় হয়ে ভাবে, নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করা মানেই অন্যায় করা। একজন ছেলেকে যখন বলা হয় “তুমি পারবে”, তখন একজন মেয়েকে বলা হয় “তুমি সাবধান থাকো।” ছেলেদের শেখানো হয় “সাহসী হও”, “বলো”, “লড়ো”, কিন্তু মেয়েদের বলা হয় “চুপ থাকো”, “সহ্য করো”, “ভদ্র থাকো”। ফলে একটা সময় পরে মেয়েরা বুঝে ফেলে, সমাজের ভালোবাসা পেতে হলে তাকে নিজের ব্যক্তিত্ব গোপন রাখতে হবে।

সে নিজের ভাবনা লুকিয়ে রাখে, কারণ সমাজ তার চিন্তা, রাগ, বা প্রতিবাদকে গ্রহণ করতে জানে না। এই এক কথার পার্থক্যই তৈরি করে দুই ধরনের জীবনদর্শন।

“ভালো মেয়ে” শব্দটা কখনোই মেয়েদের জন্য নয়। এটা সমাজের সুবিধার জন্য তৈরি করা একটি নিয়মের ছাঁচ। যাতে নারীকে সহজে নিয়ন্ত্রণ, বিচার ও সীমাবদ্ধ করা যায়। “ভালো মেয়ে” ধারণা সমাজের এক ধরনের নিয়ন্ত্রণের অস্ত্র। এর মাধ্যমে মেয়েদের স্বাধীন চিন্তা, পছন্দ-অপছন্দ, এমনকি জীবনযাপনের ধরনও নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই ধারণা ধীরে ধীরে নারীদের আত্মবিশ্বাস, আত্মসম্মান, এমনকি তাদের সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতাকেও দুর্বল করে দেয়। এটা একরকম মানসিক শৃঙ্খল — যা নারীর ভেতরের শক্তিকে চুপ করিয়ে রাখে “ভদ্রতার” নামে।

যখন কোনো মেয়ে নিজের মতো করে বাঁচতে চায়। নিজের পছন্দের পোশাক পরে, ক্যারিয়ার গড়ে, বা সম্পর্ক নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়। তখন সমাজ বলে, “ও খুব বেপরোয়া!”। যে মেয়েটি নিজের মতামত প্রকাশ করে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, সে অনেক সময় সমাজের চোখে “খারাপ মেয়ে” হয়ে যায়। যে মেয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মুখ খোলে, সে সমাজে

“অভদ্র”, “বেশি কথা বলে”, “অবাধ্য” বলে চিহ্নিত হয়।

অর্থাৎ, সমাজ চায় ভদ্র মেয়ে, কিন্তু চায় না সচেতন নারী।

অর্থাৎ সমাজ চায় না নারী স্বাধীনভাবে ভাবুক বা সিদ্ধান্ত নিক, বরং সমাজ চায় সে সম্মত হোক, বাধ্য থাকুক, নিরব থাকুক। সমাজের মতো করে বাঁচতে যেয়ে, সমাজে ভালো মেয়ে হতে যেয়ে মেয়েরা আত্নবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। লোকে কিভাবে ভালো বলবে-এই মানসিকতা নারীর মানসিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। সে নিজের স্বাধীন চিন্তাকে অপরাধ মনে করতে শুরু করে। ফলে মেয়েরা দুটি জীবনে বাস করে। একটি সমাজের সামনে “ভালো মেয়ে” সেজে থাকা, আর অন্যটি নিজের মধ্যে অবদমিত, ক্লান্ত, স্বপ্নহীন এক সত্তা।

এভাবেই “ভালো মেয়ে” হওয়ার চাপ নারীর আত্মপরিচয়কে ক্ষয় করে ফেলে। অর্থাৎ, সমাজের চোখে ভালো মেয়ে সেই, যে সমাজের নিয়মে বাঁচে, নিজের নিয়মে নয়।

অন্যদিকে, কেউ কেউ বলেন — “ভালো মেয়ে” ধারণা সংস্কৃতির অংশ, যা শালীনতা, সহনশীলতা, সৌজন্য, পারিবারিক মূল্যবোধকে টিকিয়ে রাখে। “ভালো মেয়ে” ধারণা সংস্কৃতির অংশ, যা শালীনতা, পারিবারিক বন্ধন ও সামাজিক মূল্যবোধকে রক্ষা করে। তাদের মতে, সমাজে সৌহার্দ্য বজায় রাখতে কিছু নিয়ম থাকা দরকার — যেমন বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান, দায়িত্বশীলতা, সহমর্মিতা ইত্যাদি। কিন্তু সমস্যা হয় যখন এই মূল্যবোধগুলো কেবল মেয়েদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং মেয়েদের চরিত্র বিচার হয় তাদের পোশাক, সময় ব্যবস্থাপনা বা সামাজিক আচরণের ওপর; অথচ ছেলেদের জন্য এমন কোনো কঠোর মানদণ্ড নেই।

সংস্কৃতি তখন ন্যায্য থাকে না, বরং হয়ে ওঠে পক্ষপাতদুষ্ট। এইভাবে “ভালো মেয়ে” ধারণা নারীদের উপর নৈতিক পুলিশিংয়ের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়। অনেকে বলেন — “ভালো মেয়ে” ধারণা সংস্কৃতির অংশ, যা শালীনতা, পারিবারিক বন্ধন ও সামাজিক মূল্যবোধকে রক্ষা করে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যদি সেই সংস্কৃতি নারীর স্বাধীনতা কেড়ে নেয়, তবে সেটা সংস্কৃতি নয় বরং যুগ যুগ ধরে চলা সামাজিক শাসনের রূপ। সংস্কৃতি কখনোই একপাক্ষিক হতে পারে না। যেখানে ছেলেদের স্বাধীনতা প্রশংসিত, আর মেয়েদের স্বাধীনতা প্রশ্নবিদ্ধ। সেই জায়গায় সংস্কৃতি নয়, দ্বিচারিতা কাজ করছে।

অনেকে বলে, এটি আমাদের সংস্কৃতির অংশ।মেয়েরা নম্র, ভদ্র, লাজুক হবে — এটাই তো আমাদের ঐতিহ্য। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সংস্কৃতি

কাকে বলে?

সংস্কৃতি তো জীবনের সৌন্দর্য ও সমতার প্রতিফলন,যে চিন্তা নারীর কণ্ঠরোধ করে, তাকে কষ্ট দেয়, তাকে ছোট করে, তা কোনো সংস্কৃতি নয়, তা সমাজের তৈরি শিকল। যদি সংস্কৃতি নারীর স্বাধীনতা কেড়ে নেয়, তবে সেটা সংস্কৃতি নয় বরং যুগ যুগ ধরে চলা সামাজিক শাসনের রূপ।

আজকের পৃথিবীতে মেয়েরা আর সেই পুরনো মানদণ্ডে আটকে নেই। তারা জানে — ভালো মেয়ে হওয়া মানে কারো সামনে নত হওয়া নয়,বরং নিজের প্রতি সত্য থাকা। ভালো মেয়ে সে-ই, যে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কিন্তু নিজের সম্মান নিয়েও সচেতন।

তারা ভালোবাসে, কিন্তু ভালোবাসার নামে নিজের স্বপ্ন বিসর্জন দেয় না। তারা ডাক্তার, প্রকৌশলী, সাংবাদিক, সৈনিক, উদ্যোক্তা, তারা মা-ও, কর্মীও, আর নিজের পৃথিবীর অধিনায়কও।

তারা প্রমাণ করছে — “ভালো মেয়ে”র সংজ্ঞা এখন নতুন করে লিখতে হবে। যেখানে স্বাধীনতা অপরাধ নয়, আর স্বপ্ন বিলাসিতা নয়।

দেশে পানীয় জলের ঘাটতি ও ক্রমবর্ধমান বৈষম্য

বর্তমান বিশ্বের একটি জটিল ও উদ্বেগজনক বাস্তবতা পানি সংকট। যদিও পৃথিবীর একটি বড় অংশ জলমণ্ডিত,তবু ব্যবহারের জন্য উপযোগী পানযোগ্য পানির পরিমাণ সীমিত। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দূষণের কারণে এই সংকট আরও ঘনীভূত হচ্ছে। শহর ও গ্রামের মধ্যে পানীয় জলের বৈষম্য বাড়ছে। ওয়াটার এইড-এর এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, শহর ও গ্রামের মধ্যে বৈষম্য আরও বেড়েছে, যা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।
জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়ায় মিষ্টি পানির অভাব দেখা দিয়েছে। বঙ্গোপসাগরের খুব কাছে হওয়ায় ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের পরিমাণও অনেক বেশি। বিশেষজ্ঞরা বলছে ভবিষ্যতে পানীয় জলের সন্ধানের লড়াই আরও তীব্র

হবে। উত্তর বাংলাদেশের খরা-প্রবণ বরেন্দ্রভূমি এলাকায়, মানুষকে নিরাপদ পানীয় জল পেতে ৩৫০ মিটারের বেশি খনন করতে হবে। পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে, কারণ এই এলাকায় অস্বাভাবিকভাবে কম বৃষ্টিপাতের অর্থ হল ভূগর্ভস্থ জলাধারগুলি পুনরায় পূরণ হচ্ছে না। এমনকি ঢাকায়ও মানুষ পানির সরবরাহ কমে যেতে পারে। ঢাকার ভূগর্ভস্থ জলরাশিগুলি রিচার্জ হয় যা আশেপাশের জেলাগুলিতে ভূগর্ভস্থ জলে সঞ্চারিত হয়। তবে সেই জেলাগুলিতে ভূগর্ভস্থ মিঠা জলের স্তরও নেমে গেছে, যার ফলে সমুদ্রের জল জলাশয়ে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। এভাবে চলতে থাকলে ঢাকার পানীয় জল ক্রমশই পানের অযোগ্য হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। খারাপ পানির গুণমান কৃষিকে প্রভাবিত করবে। বাংলাদেশ ধান, পাট, গম, চা, ডাল, তৈলবীজ, শাকসবজি এবং ফল চাষের জন্য উৎসর্গীকৃত জমির ৭০ শতাংশ সহ কৃষির উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করে। দূষিত নলকূপগুলি সেচের জন্য ব্যবহৃত বেশিরভাগ পানি সরবরাহ করে। ফলস্বরূপ, উচ্চ মাত্রার আর্সেনিক অনেক ফসলের উদ্ভিদ, বিশেষ করে ধান এবং মূল শাকসবজি দ্বারা শোষিত হয়। এটি মারাত্মক হতে পারে।
বাংলাদেশে পানীয় জলের ঘাটতি ও বৈষম্য জলবায়ু পরিবর্তন, অপরিকল্পিত নগরায়ণ, দূষণ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বাড়ছে, যেখানে ২০৫০ সালের মধ্যে প্রায় ২৫ শতাংশ মানুষ পানি সংকটে পড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এই সংকটের কারণে শহর ও গ্রামের মধ্যে বৈষম্য বাড়ছে, এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এর শিকার হচ্ছে। এর সমাধান হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় দ্রুত পদক্ষেপ, পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, এবং সবার জন্য পানির অধিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
পানির মান উন্নত করার জন্য জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ দারিদ্র্য হ্রাস করতে পারে এবং দ্রুত প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে পারে, বিশ্বব্যাংকের একটি নতুন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। পানি অ্যাক্সেসের উন্নতিতে দেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও, সমস্ত উন্নত পানির উৎসগুলোর ৪১ শতাংশ ই. কোলাই ব্যাকটেরিয়া দ্বারা দূষিত, যা মল দূষণের উচ্চ প্রকোপ নির্দেশ করে ৷ ‘প্রমিসিং প্রোগ্রেস: এ ডায়াগনস্টিক অফ ওয়াটার সাপ্লাই, স্যানিটেশন, হাইজিন এবং পোভার্টি’ প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে পানীয় পানির দুর্বল গুণমান ধনী-দরিদ্র এবং গ্রামীণ ও শহুরে জনগণকে সমানভাবে প্রভাবিত করে। তবে, জনসংখ্যার সবচেয়ে দরিদ্রতম কুইন্টাইল পানি সম্পর্কিত গ্যাস্ট্রো-ইনটেস্টাইনাল রোগে তিনগুণ বেশি ভোগে। আজ, বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৯৮ শতাংশ প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত পানির উৎস থেকে পানির অ্যাক্সেস রয়েছে। তবে পানির মান খারাপ। সারা দেশে নমুনা নেওয়া জলের কলের ৮০ শতাংশই. কোলাই ব্যাকটেরিয়া উপস্থিত ছিল, যা পুকুর থেকে উদ্ধার করা জলের সমান। ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিআইজিডি) ২০১৯ সালে ‘ওয়াটার গভর্নেন্স ইন ঢাকা’ শীর্ষক এক গবেষণা

প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সেখানে দেখা যায়, ঢাকায় মাথাপিছু পানির ব্যবহার ৩৬০ লিটার। এর মধ্যে বাড্ডা, কুড়িল ও জোয়ার সাহারা এলাকার মানুষের পানির গড় ব্যবহার ২১৫ লিটার। আর গুলশান ও বনানী এলাকায় মাথাপিছু পানির ব্যবহার ৫০৯ লিটার। ঢাকায় নিম্ন আয় এবং উচ্চ আয়ের মানুষের পানির মূল্য একই, প্রতি হাজার লিটারে ১৫ টাকা ১৮ পয়সা।আয়ের নিরিখে সমতাভিত্তিক মূল্য নির্ধারণের কথা ঢাকা ওয়াসা অনেক দিন ধরেই বলে যাচ্ছে। কিন্তু এটি এখনো কথাবার্তার পর্যায়েই রয়ে গেছে। দেশের প্রায় ১৩ শতাংশ জলের উত্সে আর্সেনিকের মাত্রা বাংলাদেশের প্রান্তিকের উপরে রয়েছে। চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ আর্সেনিক দূষণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জলবায়ু পরিবর্তন প্রাকৃতিক দুর্যোগের তীব্রতা এবং ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি করছে যা পানি ও স্যানিটেশন পরিষেবা ব্যাহত করছে। দুর্যোগের সময়, দেশের উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পরিবার দূষিত, অপরিবর্তিত জলের উত্সগুলিতে চলে যায়। উপকূলীয় এলাকাগুলো ক্রমবর্ধমান লবণাক্ততা দরিদ্রদের বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করছে। বাংলাদেশ এখনও বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মানুষের আর্সেনিক দূষণের সংস্পর্শে আসা দেশ। বাংলাদেশের ১.৮ মিলিয়নেরও বেশি লোকের উন্নত পানির উত্সের অ্যাক্সেসের অভাব রয়েছে। ইউএন ওয়ার্ল্ড ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০২২ অনুসারে, সবচেয়ে বেশি আনুমানিক বার্ষিক ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলনকারী দেশগুলির মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের ষষ্ঠ স্থান। বাংলাদেশ ওয়াটার পার্টনারশিপ এবং ২০৩০ ওয়াটার রিসোর্স গ্রুপ দ্বারা সমর্থিত একটি সমীক্ষা অনুসারে বর্তমান হারের তুলনায় শতকরা হার দ্রুত। ভূগর্ভস্থ একটি ভেদযোগ্য শিলা স্তরে বিশুদ্ধ পানির বিস্তীর্ণ ভাণ্ডার রয়েছে এবং সাধারণত ভূ-পৃষ্ঠের পানির মাধ্যমে তা রিচার্জ হয়। যেসব ক্ষেত্রে অ্যাকুইফার থেকে জল তোলার হার রিচার্জের হারকে ছাড়িয়ে যায়, সেক্ষেত্রে পরিচালিত অ্যাকুইফার রিচার্জ অন্যান্য উৎস থেকে জল প্রবেশ করাতে পারে যা সাধারণত ভেদযোগ্য শিলা পর্যন্ত পৌঁছায় না।
সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, বরগুনা, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, পিরোজপুরসহ উপকূলীয় অঞ্চল এবং সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জসহ হাওর অঞ্চলের গ্রামীণ নারী ও কিশোরীদের প্রতিদিনের একটি বড় সময় কাটে দূর-দূরান্ত থেকে পানীয় জল সংগ্রহে। এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে গিয়ে তারা অনেক সময় যৌন হয়রানি ও নিরাপত্তা ঝুঁকির সম্মুখীন হন। জাতিসংঘের ওয়ার্ল্ড ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিশ্বে এখনো ২.২ বিলিয়ন মানুষ নিরাপদ পানীয় জলের অভাবে ভুগছে এবং ৩.৫ বিলিয়ন মানুষ পর্যাপ্ত স্যানিটেশন সুবিধা থেকে বঞ্চিত।
উত্তর আফগানিস্তানে কুশ তেপা খাল নির্মাণ প্রকল্পের কথা বিবেচনা করলে দেখা যাবে এটি মূলত সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে গঠিত। তবে এই প্রকল্পটি আমু দরিয়া নদীর প্রায়

২০ শতাংশ পানি সরিয়ে নেবে, যার ফলে উজবেকিস্তানের কিছু অঞ্চলের চাষাবাদ মারাত্মকভাবে ব্যাহত এবং পানির ঘাটতি আরও তীব্র হবে। এতে দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কে টানাপড়েন সৃষ্টি হয়েছে। একইভাবে, বাংলাদেশও বহু বছর ধরে প্রতিবেশী দেশ ভারতের কাছ থেকে ন্যায্য পানির হিস্যা আদায়ে জোর দাবি জানিয়ে যাচ্ছে। যৌথ নদী কমিশনের (জেআরসি) চুক্তি অনুসারে, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ন্যায্য পানিবণ্টন নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও যাচাই করা জরুরি। ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে পেহেলগাম ইস্যু ঘিরে যে যুদ্ধাবস্থা ও উত্তেজনা তৈরি হয়, সেখানেও ভারত সিন্ধু নদের পানি বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেয়। এভাবে আমরা দেখতে পাই, কখনো কৃত্রিম খাদ্য সংকট সৃষ্টির মাধ্যমে গাজার হাজারো মানুষকে দুর্ভিক্ষের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, আবার কখনো আন্তঃদেশীয় নদীর পানির প্রবাহকে বাধাগ্রস্ত করে প্রতিবেশী দেশকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, পানি বা খাদ্য উভয়ই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
জাতিসংঘ সতর্ক করে দিয়েছে যে ‘বিশ্বে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার জন্য নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানীয় জল নিশ্চিত করা অপরিহার্য।’ বিভিন্ন গবেষণায় স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে, আমরা দ্রুত এক বৈশ্বিক পানি সংকটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। গত জুন মাসে ‘মার্সি কর্পস’ নামের একটি আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা বলেছে আফগানিস্তানের কাবুল বিশ্বের প্রথম আধুনিক শহর হতে পারে, যেখানে নিকট ভবিষ্যতে পানি শেষ হয়ে যাবে। এছাড়াও প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রাকৃতিক রিচার্জের হারের চেয়েও বেশি পানি উত্তোলন এবং সীমিত পরিমাণে পানি দূষণের সমস্যা দেখা দেওয়ায় শহরটি এক চরম বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই সংকটে আমরা কোথায়?: শিল্পায়ন, বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের অভাব, অকার্যকর মজুদ ব্যবস্থাপনা, পানির অসম বণ্টন, তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভূগর্ভস্থ পানির অতিরিক্ত ব্যবহার এ সবই বাংলাদেশের পানি সংকটকে দিন দিন তীব্রতর করে তুলছে। শুষ্ক মৌসুমে বিশেষ করে বোরো ধান উৎপাদনের জন্য বিপুল পরিমাণ পানির প্রয়োজন, যার প্রধান উৎসই ভূগর্ভস্থ পানি। বাংলাদেশে বার্ষিক মোট বৃষ্টিপাতের ৭০-৮০ শতাংশ হয় জুন থেকে অক্টোবরের মধ্যে। এই বৃষ্টির পানি প্রাকৃতিকভাবে লবণাক্ততা ও আর্সেনিকমুক্ত এবং এতে ক্ষতিকর খনিজের মাত্রাও কম, ফলে এটি মানুষের ব্যবহারের জন্য অনেক বেশি নিরাপদ। বিশাল পরিমাণ বৃষ্টির জল যথাযথভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে পারলে ভূগর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভরতা অনেকটাই কমানো সম্ভব। ফলে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে এবং জাতীয় গ্রিডের ওপর চাপ হ্রাস পাবে। তাই রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং ব্যবস্থাকে আরও জনপ্রিয় করে তোলার জন্য এর প্রসার ও সচেতনতা জরুরি।
ঢাকা শহরের মতো শহুরে এলাকায়, যেখানে ক্রমবর্ধমান চাহিদার ফলে ভূগর্ভস্থ পানি দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে, সেখানে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ

একটি বাস্তবসম্মত ও অর্থনৈতিক সমাধান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। টেকসই ভবিষ্যতের জন্য সরকার পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) এর মাধ্যমে বৃষ্টির পানি সংগ্রহে দীর্ঘমেয়াদি উদ্যোগ নিতে পারে। এর সফল বাস্তবায়নের জন্য রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি এবং সামাজিক সহযোগিতা জরুরি। রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিংয়ে বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে দৃঢ় নীতি গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের উজান পরিবেশের অবক্ষয় রোধে গুরুত্ব দিতে হবে। সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো ওয়াটার হার্ভেস্টিং সরঞ্জাম ও প্রযুক্তিতে ভর্তুকি প্রদান করে সাধারণ মানুষের উৎসাহ বাড়াতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে- যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটে, তা হবে পানির ন্যায্য বণ্টন নিয়ে বিরোধের কারণে। তাই একটি স্থিতিশীল বৈশ্বিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য, মানবাধিকার রক্ষা ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে, দারিদ্র্য বিমোচন এবং ধনী-গরিবের মধ্যে বৈষম্য কমাতে, পানির সুষ্ঠু ও ন্যায্য বণ্টন অপরিহার্য।
লেখক: সাংবাদিক

মেহেরপুরে কালবেলার তৃতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

আলোচনা সভা, কেক কাটা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে দৈনিক কালবেলার তৃতীয় বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টার সময় জেলা শিল্পকলা একাডেমির মিলনায়তনে আলোচনা সভা ও কেক কাটার মধ্য দিয়ে আড়ম্বরপূর্ণভাবে দৈনিক কালবেলার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালনের আয়োজন করা হয়।

জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খায়রুল ইসলাম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, কালবেলা এমন একটি পত্রিকা, যা যুগের সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে। এই যুগে টিকে থাকা সত্যিই একটি কঠিন কাজ, কিন্তু কালবেলা সেটি করতে পেরেছে।

বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জন করা সম্ভব, আর কালবেলা ঠিক সেটাই করছে। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার

মাধ্যমে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের খবর জানতে পারি। সংবাদকর্মীদের নিরলস পরিশ্রম ও দায়বদ্ধতার মাধ্যমে দেশের প্রতিটি সেক্টরের উন্নয়নে তাদের অবদান অনস্বীকার্য।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আজম, সাধারণ সম্পাদক ও দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দু।

কলেজ শিক্ষক এস. এম. রফিকুল আলম বকুল ও দৈনিক কালবেলার মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি খান মাহমুদ আল রাফির সঞ্চালনায় এ সময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) মোঃ জামিনুর রহমান খান, সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেজবাহ উদ্দিন, দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, বাসস প্রতিনিধি দিলরুবা খাতুন, এনসিপি মেহেরপুর জেলা শাখার যুগ্ম সমন্বয়কারী আশিক রাব্বি, সদস্য হাসনাত জামান সৈকত, মোঃ তামিম ইসলামসহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

কেক কাটার পর এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।